একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

'Autobiography of an Educated Prostitute': Manada Devi's Social Studies

'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত': মানদা দেবীর সমাজবীক্ষা

Name of the Author: **Shankha Dutta**

Affiliation: **Ph.D Research Scholar, Bengali Department, Kalyani University, West Bengal, India**

Abstract: The first edition of Manada Devi's autobiography 'Ek Shikkhita Potitar Atmocorit' (The Autobigraphy of an educated prostitute) was published in 1929 and soon it became imensly popular. This book was undoubtedly fresh in its content and perspective. It snatched the attention of the readers for offerinng a truthful and detailed account of the mysterious indoors of brothels from the pen of a beautiful, educated woman from an afluent and uppercaste family of Kolkata. Manada Devi claimed that she wrote this book for the welfare of the socitey and therefore she dedicated it to the youngsters and social reformers of Bengal. In addition to telling her own story, in this autobiography, she criticized various norms and trends prevalent in society, and, based on her own experiences, she wanted to warn social reformers in Bengal, and especially guardians of girls, against indulgence in the relaxation of social norms in the name of liberality and progressivism.

Keywords: Manada Devi, Rameshchandra Mukhopadhyay, Prostitute, Autobiography, Brahma Samaj, Self-control, Morality, Sex, Pulp-Fiction, Theatre, Realistic Art, Saratchandra Chattopadhyay, Rabindranath Tagore

‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’: মানদা দেবীর সমাজবীক্ষা

শঙ্খ দত্ত

মানদা দেবীর আত্মজীবনী ‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। পরবর্তী কালে আরো অন্তত তিনটি সংস্করণ বইটির জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই বই অভিনব তা বলাই বাহুল্য। এক ‘পরমা সুন্দরী’, শিক্ষিতা ধনীকন্যার পদস্খলনের ইতিবৃত্ত তথা কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীর রহস্যময়ী রূপজীবিনীদের দিনযাপনের এমন বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা বাঙালি পাঠক সমাজের কৌতুহল আকর্ষণ করতে সময় নেয়নি। লেখিকা দাবি করেছিলেন তিনি বইটি রচনা করেছেন সমাজের মঙ্গলের স্বার্থে; তাই এই বই তিনি অর্পণ করেছিলেন বিংশ শতকের বঙ্গদেশের তরুণ-তরুণী ও সমাজসংস্কারকদের হাতে। সেই কারণেই নিজের কাহিনি শোনানোর পাশাপাশি এই আত্মকথায় তিনি সমাজের প্রচলিত নানা নিয়ম-কানুনের সমালোচনা করেছেন, উদারতা ও প্রগতিশীলতার নামে সমাজবিধির শিথিলতায় প্রশ্রয় দানের বিরুদ্ধে বাংলার সমাজসংস্কারকদের এবং বিশেষত কন্যাসন্তানের অভিভাবকদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে।

মানদা দেবীর আত্মকথা বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় ‘বাল্যে’ তিনি আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯০০ সালে কলকাতায় এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে । তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল এবং বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটি জমিদারির মালিক। সুতরাং এহেন সম্পন্ন পরিবারের কন্যা হিসাবে মানদা দেবী যথেষ্ট বিলাসিতায় বড় হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম আঘাত মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু। তবু এই আঘাত ক্রমশ সয়ে যেতে পারত কিন্তু মাতৃহীনা কন্যাকে দেখাশোনার নিমিত্ত তাঁর বাবা মানদা দেবীর যে বিধবা পিসিকে আনিয়েছিলেন, তাঁরই নিরন্তর প্ররোচনায় মানদা দেবীর বাবা প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের মাত্র দু’বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। তাঁর বিমাতা ছিলেন তাঁর থেকে মাত্র এক বছরের বড়। এই ঘটনার পরে বাবার সঙ্গে ক্রমশ তাঁর মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়— “বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতীত পিতার সহিত এখন আমার সাক্ষাৎ হইত না। পূর্বে তিনি আমাকে স্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কাছে বসিয়া গান শুনিতেন, এখন আর তাহা নাই।” [১] মানদা দেবীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি এই আঘাতই প্রাথমিকভাবে তাঁকে পিছুটানহীন ও অপরিণামদর্শী করে তুলেছিল। তাছাড়া বিমাতা মাত্র এক বছরের বড় হওয়ায় মায়ের শাসনও তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। এতদিন মানদা দেবীর সঙ্গী ছিল তাঁর থেকে দু’বছরের বড় এক মামাতো দাদা নন্দলাল— তাঁর নন্দদাদা। কিন্তু এই সময় তাঁর বাবা উঁচু ক্লাসের পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোনো গৃহশিক্ষকের বদলে এক অবিবাহিত তরুণ জনৈক মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানদার শিক্ষকরূপে বহাল করলেন। অভিভাবকহীন মানদা দেবীর বয়ঃসন্ধিতে এই তরুণ শিক্ষকের সান্নিধ্য তাঁর মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অচিরেই ‘মাস্টার মহাশয়’ থেকে তিনি হয়ে উঠলেন ‘মুকুল দাদা’। মানদা ছিলেন থিয়েটার ও সিনেমার অনুরাগী। মুকুল দাদার আগমনের পর থেকে মানদা ও নন্দলালের সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক হিসাবে তিনিও প্রায়ই থিয়েটার ও

সিনেমায় যেতে শুরু করলেন। মানদা দেবীর বক্তব্য অনুযায়ী মিনার্ভা থিয়েটারে 'শিরীফর্হাদ' নাটকে 'ফরহাদের অপূর্ব প্রেম' ও 'শিরীর আত্মবিসর্জন' তাঁর কিশোরী হৃদয়কে প্রেমে উদ্বেল করে তুলেছিল । সেইসময় তাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার ছিল কেবল একজন বাইরের পুরুষেরই— তিনি 'মুকুল দাদা' । তখন থেকেই তাঁরা গোপনে একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন করতেন। কিন্তু মানদা দেবীর আত্মকথা থেকে আমরা নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি তাঁদের সম্পর্ক যদি স্থায়ী হত তবে মানদা দেবীর এই পরিণতি হয়ত হত না। তিনি লিখেছেন বাবা ও বিমাতার প্রবাস ভ্রমণকালে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলে মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিনরাত তাঁর সেবা করেছিলেন । ডাক্তার ডাকা, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানো এমনকি তিনি মানদা দেবীকে খাইয়ে পর্যন্ত দিয়েছেন। মানদা জানিয়েছেন অসুখে তাঁর সেবার সুযোগ পাওয়ার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে 'ঝরণা' নামে একটি গীতিকাব্য লিখে মুকুল তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ই তাঁদের বাড়িতে চাকরি প্রার্থী হয়ে আবির্ভূত হন মানদা দেবীর 'রমেশদা' । 'রমেশদা' বা রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মানদা দেবীর জ্ঞাতি দাদা। তিনি যখন মানদা দেবীর বাড়িতে আসেন সে বছরই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্বয়ং রমেশই মানদার কাছে তা জানিয়েছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও মানদা ও রমেশ পরস্পরের প্রতি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, মানদা গর্ভবতী হন এবং অবশেষে 'রমেশদা'র সঙ্গে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করেন।

এখানেই মানদা দেবীর সামাজিক জীবনযাপনের ইতি। এর পরে তাঁর আত্মকথায় আমরা পাই 'পতিতা' জীবনের বৃত্তান্ত। রমেশদার সঙ্গে সম্পর্কের অব নতি হলে রমেশ মানদাকে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এরপরই শুরু হয় তাঁর সত্যিকারের জীবন সংগ্রাম। বাস্তব জীবনের কর্কশ, বন্ধুর পথে হেঁটে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সমাজে ফেরার চেষ্টা করে বিফল হয়ে অবশেষে মানদা দেবী জীবিকানির্বাহের জন্য পতিতাবৃত্তিতে পদার্পণ করেন। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কেবল নিজের জীবনকাহিনির বর্ণনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নিজের এই পরিণতির জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা, অনুশাসনের শিথিলতা এবং আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতার অজুহাতে পুরোনো কিছু সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তনকেই তিনি দায়ী করেছিলেন। সেই অভিযোগগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর জীবনবোধ ও সমাজচিন্তা। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই অভিযোগগুলির পর্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই আত্মচরিতে বারবার মানদা দেবী অনুযোগ করেছেন তাঁর প্রতি তাঁর বাবার অমনোযোগ ও শাসনহীনতার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে বাবার দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তাঁর আদর থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগটি সত্য। কিন্তু তিনি কেন ঘর ছেড়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ হিসাবে তিনি বলেছিলেন— "শরীরধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের যৌবনচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে।" [২] আমরা দেখেছি মানদা দেবীর বাবা নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কন্যা সন্তানকে অন্তঃপুরে রেখে চিরাচরিত প্রথায় মানুষ করার বদলে তিনি মানদা দেবীকে বেথুন স্কুলে পড়িয়েছিলেন। মানদা দেবী উল্লেখ করেছেন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ম্যাট্রিক পাশ না করলে তাঁর বিয়ে দেবেন না। বলাই বাহুল্য

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত পরিবারের নারী শিক্ষার এই সুযোগ পেয়েছিলেন মানদা দেবী তাঁদের একজন। অথচ মানদা দেবী এই সুযোগকে তাঁর অধঃপতনের কারণ হিসাবেই বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর কথায়— "অভিভাবকের অসাবধানতায় ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল, ... বিবাহের জন্য মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।" [৩] তাঁর আরেকটি বড় অভিযোগ ছিল সিনেমা-থিয়েটার ও সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে:

> "আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি... যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্মভাবের উদয় হয়, এমন কোনো পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই |... থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণতরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে।"[৪]

এই অভিযোগের কয়েকটি ভাগ রয়েছে। সেই মতো আমরা প্রতিযুক্তিগুলি পেশ করতে পারি। বেথুন স্কুলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কমলার সঙ্গে মেয়েলি আলাপচারিতায় প্রায়ই উঠে আসত কমলার স্বামীর প্রসঙ্গ। তাদের স্বামী-স্ত্রীর চিঠিগুলি দুজনে একসঙ্গে বসে পড়তেন। ফলে "স্বামীপ্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি জানিতাম। প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, বাসররজনী যাপন, মান-অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া মেয়েমহলে নিত্য আলোচনা হইত।" [৫] একেই কি অসৎ সঙ্গ মনে করেছেন মানদা দেবী? কমলার স্বামী তাঁর বাবার আদেশে কমলাকে ত্যাগ করেন কারণ পরে জানা গেছিল কমলার মা আসলে ছিলেন তাঁর বাবার রক্ষিতা, বিবাহিতা স্ত্রী নন। অথচ 'পতিতার কন্যা' হলেও স্বামীপরিত্যক্তা কমলা কিন্তু মানদার মতো অসংযমী হননি, স্বেছাচারের পথে হাঁটেননি। আত্মকথার শেষপর্যন্ত কোথাও আমরা কমলার ব্যভিচারের পরিচয় পাইনি। পরে মানদার গৃহশিক্ষক মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকে বিবাহ করেন।

মানদা দেবী আক্ষেপ করে বলেছেন ধর্মভাব ও সংযম শিক্ষার উপযোগী বইয়ের অভাবে কেবল সাহিত্যচর্চা করেই তাঁর চারিত্রিক গঠনে ত্রুটি ঘটেছে । অথচ তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁদের পতিতা পল্লীতে একটি দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধবা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তাঁর গুরু 'শ্রী...বিদ্যাভূষণ' তাকে প্রতারণা করেছেন। কিংবা উদ্ধার আশ্রমে থাকাকালীন যে রাজবালার সঙ্গে মানদার আলাপ হয়েছিল, পতিতাবৃত্তিতে নামার পর তার ঘরে আসতেন একজন খুব নামকরা মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী অধ্যাপক। তাঁকে মানদাও স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রপাঠ বা ধর্মাচরণ যে মানুষকে জিতেন্দ্রিয় করে তুলবেই তার কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া, ধর্মভাব জাগানোর উপযুক্ত হিন্দু পুরাণগুলি সম্পর্কে মানদা দেবীর যে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না এমন নয়। কমলার স্বামী তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি লিখলে প্রত্যুত্তরে কমলা তাকে পৌরাণিক ঘটনার দৃষ্টান্ত টেনে স্বামীর কর্তব্য স্মরণ করার জন্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তার ভাষা জুগিয়েছিলেন মানদা দেবীই। সেখানে পরশুরামের প্রায়শ্চিত্ত, অম্বার তপস্যা, ভীষ্মের শরশয্যা, রামচন্দ্রের বিলাপের প্রসঙ্গ এনেছিলেন তিনি।

আসলে আমরা অনুমান করতে পারি, বয়ঃসন্ধির সূচনা থেকেই তাঁর প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষাই মূলত তাঁর দুর্ভোগের জন্য দায়ী। এই আসক্তিই বারবার তাঁর নীতিবোধ কিংবা সংযমকে পরাজিত করেছে। এর সপক্ষে একাধিক প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারি।

রমেশদার আগমনের পূর্বে মুকুলদার প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি। মুকুলদার যে সেবার বর্ণনা আমরা পেয়েছি তাতে মানদার প্রতি তাঁর আন্তরিকতাই প্রমাণ হয়। জ্বরের ঘোরে মাতৃহারা মানদার মুখে মায়ের উল্লেখ শুনে মুকুলদা অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না একথা মানদা দেবী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। গৃহত্যাগের দিন রমেশদা ও মানদা দেবীকে হাওড়া স্টেশনের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েও তিনি একইভাবে চোখ মুছছিলেন। অথচ মানদা বেছে নিয়েছিলেন রমেশদাকে, তিনি বিবাহিত জানা সত্ত্বেও। অর্থাৎ কমলার স্বামীকে নীতিবোধের উপদেশ দিলেও নিজে কিন্তু সংযমী হওয়ার চেষ্টা করেননি বা রমেশদার শারীরিক আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার বদলে প্রথম দিন থেকে প্রশ্রয় দিয়েছেন— "আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুতাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সংকোচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।" [৬] নিজের 'ইচ্ছা'র জন্য তিনি বারবার দায়ী করেছেন অপরকে।

প্রসঙ্গত, মানদা দেবী আত্মচরিতে নিজের পরিণতির জন্য রমেশদাকে দায়ী করায় রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে 'রমেশদার আত্মকথা' লিখেছিলেন। তাঁর অসংযম ও ব্যভিচারের ইতিহাস আরো কদর্য। তিনি সজ্ঞানে নারীদের প্রতারণা করেছেন। লাম্পট্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল এইপ্রকার— বরেণ্য দেশনেতা, উকিল, অ্যাটর্নি, রাজা-মহারাজা যদি লাম্পট্য করেও পূজিত হতে পারেন তবে তিনিই বা পিছিয়ে থাকেন কেন? কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা উভয়ের মিল পাই। উভয়েই নিজেদের অসংযম ও ব্যভিচারের জন্য পরিবার, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য-থিয়েটারকে দায়ী করেছেন বারবার।

রমেশদার কাছে পরিত্যক্ত হওয়ার সময় মানদা দেবী ছিলেন আসন্নপ্রসবা। অর্থের অভাবে দু'দিন অভুক্ত অবস্থায় বৃন্দাবনের বংশীঘাটের কাছে রাস্তায় শুয়েছিলেন তিনি। এক বাঙালি মোহান্তের দয়ায় অবশেষে মানদা আশ্রয় পান আশ্রমের পাশের বাগানে। ইতিমধ্যে তাঁর বাবা চিঠি লিখে জানিয়েছেন মানদাকে তিনি আর গ্রহণ করবেন না। কিছুদিন পর মানদা দেবী ওই আশ্রমে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। অথচ মোহান্তজীর এত অনুগ্রহ এবং নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় সমাজচ্যুত হবার পরেও আমরা দেখলাম মানদা নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করেননি বরং মোহান্তের এক শিষ্যকে প্রেমপত্র দিতে গিয়ে ধরা পড়ে আশ্রম থেকে বিতাড়িত হন।

মানদা দেবীর অসংযমের আরেকটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি। মোহান্তের নির্দেশে বৃন্দাবনের আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি মোহান্তেরই ব্যবস্থাপনায় আশ্রয় পেয়েছিলেন কলকাতার একটি নারী-উদ্ধার আশ্রমে। সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা এইরকম— "কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতেন।" [৭] মানদা এরপর তাঁর গুপ্ত প্রণয়ীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। লক্ষণীয়, এর আগে 'দেহ বিক্রয়' অধ্যায়ে মানদা দেবী লিখেছেন কলকাতা শহরে যে স্ত্রীলোকেরা চাকরি বা ব্যবসায় যুক্ত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পতিতাবৃত্তিতে অভ্যস্ত কারণ

তারা বিবাহিত জীবনের সংযমে অভ্যস্ত নন। বিবাহিত জীবনের সংযম বলতে তিনি নিশ্চিত ভাবেই বোঝাতে চেয়েছিলেন একটি সমাজস্বীকৃত বন্ধনের রক্ষাকবচের আড়ালে যৌনজীবন উপভোগ করা এবং একগামিতা । কিন্তু আমরা দেখলাম, রমেশদার সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতার পরেও তিনি নিজে উদ্ধার আশ্রমে প্রথমে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হন এবং পরে উক্ত সামাজিক স্বীকৃতির সন্ধানে বিবাহের প্রস্তাব দেন। এই পর্বে আশ্রম কর্তৃপক্ষের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ও বিয়ে করতে পারার আশায় মানদা দেবীর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তাঁকে নিরুপায় হয়েই পতিতা পল্লীতে আশ্রয় নিতে হয় এ কথা সত্য। কিন্তু মানদা দেবীর স্বীকারোক্তি থেকেই আমরা জানতে পেরেছি তাঁর নন্দদাদা জানিয়েছিলেন মানদা দেবী যদি পতিতাবৃত্তি থেকে অর্জিত সকল ঐশ্বর্য এক বস্ত্রে ত্যাগ করে আসেন তবে তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবেন বোন হিসাবে । নন্দলাল ছিলেন স্বদেশি ভাবধারায় দীক্ষিত দেশব্রতী। সচ্চরিত্র এই যুবক ব্রহ্মচর্য পালন করতেন । কিন্তু উত্তরণের এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েও মানদা তা গ্রহণ করেননি।

আমরা বুঝতে পারি, মানদা দেবী কখনই উপলব্ধি করেননি যে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, নীতি-মূল্যবোধ বই পড়ে শেখার জিনিস নয়, তা কিছুটা সহজাত এবং কিছুটা চেষ্টালব্ধ। রমেশদার আত্মকথাতেও আমরা দেখেছি 'আলোকপ্রাপ্ত, বিলাত প্রত্যাগত এবং বিলাত প্রত্যাগতের অনুসরণকারী আধুনিক প্রগতিপ্রাপ্তা পরদা-বিরোধী' সমাজের মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মেশার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাঁদের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যেই নিজের 'দেবতুল্য' এক ব্রাহ্ম অধ্যাপকের কন্যা লীলাকেও রমেশ হিন্দু-ব্রাহ্মের ভেদাভেদ ভুলে শরীরী প্রেমে সাড়া দিতে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না লীলা সেই মুহূর্তে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। অথচ ওই একই সমাজের অনেক আধুনিকা মহিলা রমেশকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। অর্থাৎ আবার আমরা প্রমাণ পেলাম একই পরিবেশে বড় হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। মানদা ও কমলা যেমন বেথুন স্কুলের সহপাঠী ছিলেন, একই ভাবে রমেশদা ও মুকুলদাও স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠী ছিলেন। অবাধ মেলামেশার সুযোগ তারাও পেয়েছিলেন কিন্তু তবু কমলা ও মুকুলের জীবন কিন্তু মানদা ও রমেশের পরিণতি পায়নি।

এবার আসা যাক মানদা দেবীর 'তরল' সাহিত্যের প্রতি অভিযোগে। নন্দলালের শুদ্ধ চরিত্র ও হৃদয়ের উদারতার প্রধান কারণ মানদা দেবীর মতে— "আমার মত সাহিত্যচর্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে।"[৮] প্রথমেই আমরা দেখে নেব কোন কোন সাহিত্যিকের রচনা তিনি পড়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন "মুকুলদার অনুগ্রহে শেলি, বায়রন, শেক্সপীয়র, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।" [৯] পরে সরাসরি সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন:

> "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি কুলটার চরিত্রের অপর-এক দিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং বহু তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।... এই

সকল উপন্যাস ও কথাসাহিত্য তরুণ যুবকযুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল।"[১০]

এছাড়াও তাঁর মতে:

"যাহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাহাদের কোনো জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরণের লোক। তাহারা শুধু চিন্তা লইয়াই খেলা করেন, কর্মের ধারেও ঘেঁষেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল।"[১১]

সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিশেষত 'রিয়েলিস্টিক আর্ট'-এর বিরুদ্ধে মানদা দেবীর এই প্রকার অভিযোগ কেবল অর্থহীন তাই নয়, তা ওঁর অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক। বিশেষত, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকে মানদা তরুণ প্রজন্মের পক্ষে ভুল দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই তাঁর চিন্তার স্ববিরোধ ধরা পড়ে। আমরা দেখেছি উদ্ধার-আশ্রমের কর্তৃপক্ষের লালসা থেকে বাঁচতে মানদা দেবী ব্রাহ্মসমাজের দ্বারস্থ হয়েও তাদের সহানুভূতি পাননি, প্রত্যাখ্যাত হন। অথচ পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদারতার কথা অন্য এক রূপজীবিনীর মুখে শুনে মানদা দেবী আক্ষেপ করে বলেছিলেন— "আর এখন ব্রাহ্মসমাজ কী হয়েছে। আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় নিতে গেলাম, তারা আমাদের নিলে না। ... বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে আমাদের এ দশা হত না।"[১২] অর্থাৎ তিনি নিজেও পতিতা হিসাবে এককালে সমাজের সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সেজন্য হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেও রাজি ছিলেন। মানদাদেবী পরে নন্দদাদার আশ্রয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও নেননি, কিন্তু তিনি নিজেই একাধিকবার উল্লেখ করেছিলেন যে পতিতাপল্লীতে বাস্তবিকই অসংখ্য নারী ছিলেন যারা সম্পূর্ণ বিনাদোষে সেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধর্ষিতা অথবা লুণ্ঠিতা। নিরপরাধ এই নারীদের সমাজের সহানুভূতি ও পুনর্বাসন প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী চরিত্রটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তরুণরা দলে দলে পতিতা পল্লীতে যাচ্ছে প্রণয়িণীর সন্ধানে— এটি অতি সরলীকরণ। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছিলেন শৈশবেই শ্রীকান্তকে ভালোবেসে পরে ভাগ্যের ফেরে বাইজির পেশা গ্রহণ করলেও রাজলক্ষ্মী আজীবন মনে মনে শ্রীকান্তের প্রতি নিষ্ঠা ও সতীত্ববোধের দৃষ্টান্ত রেখেছিল । শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কে ভোগের কলুষ ছিল না, ত্যাগ, সেবা ও সহনশীলতার কৃচ্ছ্রসাধন ছিল। রাজলক্ষ্মী, অভয়া কিংবা অন্নদাদিদির মতো সাধ্বী নারীরা যে সমাজের সহানুভূতি পায়নি, যে সমাজ তাদের বহিষ্কার করেছে, সেই সমাজের বিচক্ষণতাকেই কাহিনিতে লেখক প্রশ্ন করেছিলেন। কিশোরী বয়সের মানদা উপন্যাসটির গভীরতা স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এখানে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

থিয়েটারে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের অভিনয়ের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। ছোটবেলায় মানদা দেবী বাবার সঙ্গেই থিয়েটার ও সিনেমায় গেছিলেন একাধিক বার। পরে নন্দদাদা, পিসিমা, 'মুকুল দাদা', 'রমেশদা'ও সঙ্গী হয়েছেন। সেখানে দেখা শিরী-ফর্‌হাদের প্রেম কিশোরী মানদা দেবীকে প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই থিয়েটারের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি বারবার তাঁর পাঠকদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন:

"এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্বনাশী বিষ ছড়ানো হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন... পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের স্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন, স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন তাঁহার স্ত্রী অভিনয়চ্ছলে অপরের সহিত প্রেম করিতেছেন, পিতা দেখিতেছেন কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছলাকলা শিখিতেছে।"[১৩]

এরপরেই তাঁর অভিযোগ:

"যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারের যাইয়া নটীদের গানের মহলা দেখাইতেছেন ।... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, লেডী অবলা বসু, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, মিসেস বি. এল. চৌধুরী, সরলা দেবী- ইঁহাদের মত লোকও ভদ্রঘরের যুবতীদের নৃত্যের সমর্থন করেন।"[১৪]

থিয়েটারের প্রতি এই বিদ্বেষ রমেশদার আত্মকথাতেও সুলভ। তিনি জানিয়েছেন—
"যে সকল কারণে আমার মত লম্পট পতিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে... অবাধ মেলামেশা, ভদ্রমহিলার থিয়েটার ও নৃত্য তাহার মধ্যে প্রধান।" [১৫] রমেশ রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করেছিলেন অমার্জিত ভাষায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চুল-দাড়িতে কলপ মেখে 'কচি' সেজে মেয়েদের নিয়ে নাট্যাভিনয় করে সমাজ কলুষিত করছেন এমন অভিযোগও করেছেন তিনি। ঠাকুর পরিবার ও শান্তিনিকেতনের চারপাশে আভিজাত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বলয়কেও তিনি ধাপ্পাবাজি বলেছেন। এমনকি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ঠাকুর পরিবারের 'পথভ্রষ্টা' কন্যা কমলাদেবীর মতামত উদ্ধৃত করেছেন— "আমার চটুল নৃত্যাভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইত, তাহাই আমার পতনের অন্যতম কারণ— ।"[১৬] অথচ নিজেকে পথভ্রষ্ট জানা সত্ত্বেও কেন কমলাদেবী তাঁর দুই কন্যা সাবিত্রী ও সুকৃতিকে স্বেচ্ছায় একই পথে চলতে বাধ্য করেছিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা তাঁর স্বার্থপরতা ও ব্যবসায়িক মনের দিকটি দেখতে পাই।

মানদাদেবীর অভিজ্ঞতায় পতিতাপল্লীর নারীরা থিয়েটারের মাধ্যমে ভদ্রজনের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাচ্ছে এবং ফলস্বরূপ নীতিনৈতিকতা ও সুস্থ দাম্পত্যজীবন ভুলে তরুণরা পতিতাপল্লীতে আসার সাহস পাচ্ছে। রমেশের বক্তব্য ছিল ভদ্রঘরের কুমারী ও বিবাহিতা নারীরা নাচ ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে অন্তঃপুরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং নারীলোলুপ প্রবঞ্চকের হাতে পড়ছেন। তাঁদের এই অভিযোগের কিছুটা সারবত্তা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এখানে আবারও মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও সংযমের প্রসঙ্গ এসে যায়। মানদা নিজে অসংযমী ছিলেন, কিন্তু এক বাগানবাড়িতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অপরাজিতার মতো গৃহবধূকে যাকে তার পিসিশাশুড়ি জমিদারের অঙ্কশায়িনী করতে চেয়েও ব্যর্থ হয় । অপরাজিতার পূর্বে তার স্বামীর দুই স্ত্রীকে পিসিশাশুড়ির অবাধ্যতার জন্য গায়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছিল। মৃত্যু নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও অপরাজিতা তার সতীত্ব বিসর্জন দেয়নি এবং তারও একই পরিণতি হয়েছিল। রমেশও ব্যর্থ হন অধ্যাপকের মেয়ে লীলার ক্ষেত্রে— উভয়ক্ষেত্রেই সংযম ও নীতিবোধের দৃঢ়তার পরিচয় ছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি নিজেদের নীতিজ্ঞান ও সংযমের অভাব এবং প্রবল যৌনক্ষুধার জন্য তারা সমাজের পরিবর্তনমুখিতাকে দায়ী করে নিজেদের দোষস্খালন করতে চেয়েছেন।

আরেকটি ক্ষেত্রেও মানদা দেবী পতিতাপল্লীর নারীদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছেন— তা হল জনকল্যাণমূলক ও দেশের কাজে তাদের প্রকাশ্যে যোগদান করার স্বাধীনতা । একেও তিনি নব্য রিয়েলিস্টিক আর্টের কুপ্রভাব বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ১৯১৮ সালের পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে দেশের নেতৃত্বভার এলে তিনিই দেহোপজীবিনী নারীদের ঔদার্যের সঙ্গে দেশের কাজে নিযুক্ত করেন। ফলে প্রথমে ১৯১৫তে ইস্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফান্ডের জন্য এবং পরে ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনেও তারা প্রকাশ্যে ভদ্রজনের সঙ্গে মিশে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মানদা দেবীর মতে— "পতিতা নারীদের একটা প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচ্চরিত্র ও সংযত চিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং তাহার সংযম ও পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা একটা বীরত্বের কার্য বলিয়া মনে করে।" [১৭] মানদা দেবী নিজেকেও এর ব্যতিক্রম দাবি করেননি। এর ফলে দেশব্রতী অসংখ্য তরুণ তাদের ব্রত ভুলে ইন্দ্রিয়সুখের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি রমেশদার মতো ভোগী পুরুষও মানদাদেবীর বাবার কাছে চাকরির উমেদারি করতে আসার পূর্বে স্বদেশের 'হুজুগে' মেতেছিলেন, একথা মানদাদেবীর লেখাতেই আমরা পেয়েছি। অথচ তার বহু আগে থেকে কলেজে পড়াকালীনই রমেশ পতিতাপল্লীতে নিয়মিত যেতেন, নারীসঙ্গ লাভের আশায় উচ্চমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মসমাজে মিশতেন, এমনকি স্কুলে পড়াকালীন তাঁর গ্রামের মেয়ে রমলার অভিসারের দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে তার গোপনীয়তা রক্ষার দাম হিসাবে কীভাবে রমলাকে শোষণ করেছেন সেকথা আত্মকথায় স্বীকার করেছিলেন। উল্টোদিকে মানদার মামাতো দাদা নন্দলাল দেশের সেবার ব্রত নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন এমনকি মানদাকে নতুন করে বাঁচার জন্য আদিমতম পেশাটি ত্যাগ করে তাঁর কাছে আসতেও সম্মতি দিয়েছিলেন। নন্দদাদার বন্ধু ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় উপেনবাবুও গান্ধিজির নির্দেশে মদ্যপান না করার আর্জি নিয়ে পতিতা পল্লীতে মানদার ঘরে এসেছেন কিন্তু মানদার থেকে একটি পানও গ্রহণ করেননি। সুতরাং স্বদেশিয়ানা যাদের কাছে 'হুজুগ' ছিল, তারাই সম্ভবত সহজে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

একই কারণে মানদাদেবী অন্তঃপুরের মহিলাদের সেই সময় রাজনৈতিক কাজে, দেশের কাজে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বয়ঃসন্ধিতে যৌনবোধ জেগে ওঠার সময় নারীর বিবাহের আয়োজন না করলে তাদের পরিণতি তাঁর মতো হয়, তারপর বলেছেন নারীরা বিবাহের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে না এলে সংযম তৈরি হয় না; তৎসত্ত্বেও দেখা গেল দেশের কাজে পথে বেরিয়ে উচ্চবর্ণের অনেক মহিলাও স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন প্রণয়ীর সঙ্গে নতুন সংসার পাতলেন। এই কারণেই মানদা দেবী নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিরোধিতা করেছেন। ছেলে-মেয়ের একই কলেজে পড়াশোনা করাকে সমর্থন করেননি। কবি নজরুল ইসলামের হিন্দু নারীর সঙ্গে বিয়েকে তিনি অবাধ মেলামেশার বিষময় ফল হিসাবেই দেখেছেন। বাল্যবিবাহ রোধের উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৯২৯-এর শারদা আইনও তিনি সমর্থন করেননি। নারীর চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চোদ্দো বছরের পূর্বেই নারীর বিবাহ হোক চেয়েছেন তিনি। পুরুষের লাম্পট্য, অবলা মেয়েদের উপর অত্যাচার কিংবা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করাকে তিনি বারবার নিন্দা করেছেন ঠিকই, কিন্তু মেয়েদের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি নারীকে যেভাবে অন্তঃপুরবাসিনী

করে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তা বর্তমান যুগের সাপেক্ষে অচল। এছাড়াও বিয়েই যে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ, মানদা দেবীর এমন ধারণার উপযুক্ত কোনো প্রমাণ ছিল কি? রমেশদা বিবাহিত জেনেও, স্বয়ং তিনি জ্ঞাতি বোন হয়েও তাঁর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। রমেশদার আত্মকথা থেকে জানা যায় তাঁর স্ত্রী কলেরায় মারা গেছিলেন, নাহলে রমেশদার মতো স্বামী কি আদৌ তাঁর রক্ষাকবচ ছিলেন— এই প্রশ্ন থেকে যায়। মানদা শরৎ-সাহিত্যের রাজলক্ষ্মীকে পতিতা বলে উল্লেখ করেছিলেন, অথচ আমরা জানি রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর মাকে তাদের বাবা দ্বিতীয় বিবাহের পর তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মামাদের আশ্রয়ে উভয় বোনের একসঙ্গে শাস্ত্র মেনে বিবাহ হয় বাঁকুড়ার এক পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। সেই ব্রাহ্মণ বিয়ের পর চিরকালের মতো গ্রাম ত্যাগ করে। বিয়ে কি কোনো ক্ষেত্রেই অজ পল্লীগ্রামের নারীদের সুরক্ষা প্রদান করেছিল?

পরিশেষে এটাই বলার, মানদা দেবীর আত্মচরিতের বিরুদ্ধে সেই যুগে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলে তিনি আত্মকথার চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর পাঠপ্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন— "জননীর স্তন হইতে শিশু দুগ্ধই গ্রহণ করে কিন্তু জলৌকা বা জোঁক সেই স্তন হইতে রুধির ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারে না।" [১৮] এই মন্তব্যটি মানদা দেবী তাঁর বইয়ের সমালোচকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেও আমাদের মনে হয় এটি তাঁর ও রমেশদার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা উভয়েই শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক নিয়ম, সাহিত্য-থিয়েটার, নৃত্য-গীত পরিবেশন, মহিলাদের পর্দার অবরোধ সরিয়ে বাইরের জগতে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া— সবের থেকেই কেবল জোঁকের মতো রুধিরটুকুই পেয়েছেন। অমৃত তাঁদের নাগালে আসেনি।

এই প্রবন্ধে মানদা দেবী তাঁর করুণ পরিণতির জন্য বাহ্যিক যে কারণগুলিকে দায়ী করেছিলেন, আমরা মূলত তারই সমালোচনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি ওই একই পরিবেশে অন্য অনেকেই নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মানদা দেবীর বিপথগামিতার কিছু কারণ অবশ্যই ছিল। মায়ের স্নেহ ও শাসনের অভাবের কথা তিনি বারবার বলেছেন। তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিবাহের পরেও যদি কন্যার প্রতি আরেকটু মনোযোগী হতেন, তবে তাঁর শাসন ও আদর হয়ত মানদাদেবীকে এতটা বেপরোয়া ও অসাবধানী করে তুলত না। এমনকি মায়ের মৃত্যুর মাত্র দু'বছরের মধ্যে বাবার যৌনসঙ্গী হয়েছেন কন্যার সমবয়সী একটি কিশোরী— এই ঘটনা হয়তো বয়ঃসন্ধির সূচনায় দাঁড়িয়ে থাকা মানদা দেবীর অবচেতন মনের যৌনচেতনায় গভীর আঘাত করেছিল যে কারণে তাঁর নিজের যৌনচাহিদা পূরণে নৈতিকতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই যে মুহূর্তে তাঁর যৌনচেতনার বিকাশ ঘটেছে সেই মুহূর্তেই তিনি অসংযমী হয়ে পড়েছিলেন। এই পর্বে তাঁর বিমাতা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। যে মাতৃহারা কন্যা বাবার আদর ও মনোযোগ প্রত্যাশা করছে, তারই চোখের সামনে তার সমবয়সী একটি কিশোরীর সঙ্গে তাঁর বাবার এই যৌনজীবন হয়তো মানদা দেবীর অবচেতন মনে বাবার সংযমহীনতা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাই অনুমান করা যায়, বাকি যে কারণগুলি মানদা দেবী উল্লেখ করেছেন তা তাঁর নৈতিকতা ও সংযমের ভারহীন প্রবৃত্তির সন্তুষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করেছিল, তার বেশি নয়।

তথ্যসূত্র

১। দেবী মানদা, শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত, ২য় খসড়া সং ৩য় মুদ্রণ, খসড়া প্রকাশনী, কলকাতা -৬৫, প্রথম প্রকাশ ১৯২৯, জানুয়ারি ২০২৬, পৃ. ২২
২। তদেব পৃ. ৩৬
৩। প্রাগুক্ত
৪। প্রাগুক্ত
৫। তদেব পৃ. ৩১
৬। তদেব পৃ. ৩৪
৭। তদেব পৃ. ৫৭
৮। তদেব পৃ. ৮৬-৮৭
৯। তদেব পৃ. ৩৭
১০। তদেব পৃ. ৬৯
১১। তদেব পৃ. ৩৭
১২। তদেব পৃ. ৬২
১৩। তদেব পৃ. ৬৯
১৪। প্রাগুক্ত
১৫। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র, রমেশদা'র আত্মকথা, মানদা দেবী ও রমেশদা'র চাপান-উতোর, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯ পৃ. ১৯৬
১৬। প্রাগুক্ত
১৭। দেবী, মানদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৮। ঐ, চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা